বাজেটে ২০২৩
শ্রমিক সমাজ
কী পায়—কী চায়

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

এক

শ্রমখাতের দিকে বাজেট কতটা মনযোগী?

বাংলাদেশে সর্বশেষ শ্রমজরিপ হয়েছে ২০২২ সালে। তার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ২০২৩-এ। জরিপ অনুযায়ী দেশে শ্রমশক্তিতে এখন ৭ কোটি ৩৪ লাখ ১০ হাজার মানুষ আছেন।

২০১৮ সালের মার্চে ২০১৬-১৭ সালের শ্রমজরিপের তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল। তখন শ্রমশক্তির* আকার ছিল ৬ কোটি ৩৫ লাখ। অর্থাৎ ৫ বছরের ব্যবধানে শ্রমশক্তির আকার বেড়েছে প্রায় এক কোটি। অর্থাৎ বছরে গড়ে প্রায় ২০ লাখ নতুন শ্রমশক্তি যুক্ত হয় পুরানো ভান্ডারে। এই শ্রমশক্তির বড় অংশ প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের 'শ্রমিক'। প্রশ্ন হলো, তাদের উন্নয়নপ্রশ্নে জাতীয় বাজেট কতটা যত্নশীল? সে বিষয়টা কি আমরা খেয়াল করছি? সে বিষয় নিয়ে আমরা কি কথা বলতে রাজি আছি?

বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনীতির মূল দলিল বাৎসরিক বাজেট। আর দেশে শ্রমখাত সংশ্লিষ্ট দুটি মুখ্য মন্ত্রণালয় হলো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। গত ছয় অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে এই দুই মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দচিত্র ছিল নিম্নরূপ:**

---

* সরকারি জরিপে শ্রমশক্তি বলতে বোঝানো হয়েছে ১৫ বছরের অধিক বয়সী, কাজ করছে বা করতে সক্ষমদের। যারা কর্মরত হতে পারেন বা কর্মহীন অবস্থাতেও থাকতে পারেন।

** তথ্যসূত্র: বিভিন্ন বছরে দেয়া অর্থমন্ত্রীর বাজেট বর্ক্তৃতা।

সারণী : এক

বছর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ (হিসাবঃ কোটি টাকায়)	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ (হিসাবঃ কোটি টাকায়)	সকল মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের জন্য সম্মিলিত বরাদ্দ (হিসাবঃ কোটি টাকায়)
২০১৬-১৭	৩০৭	৫৬০	৩,৪০,৬০৫
২০১৭-১৮	২৬৮	৬৮৮	৪,০০,২৬৬
২০১৮-১৯	২২৭	৫৯৫	৪,৬৪,৫৭৩
২০১৯-২০	৩১৩	৫৯১	৫,২৩,১৯০
২০২০-২১	৩৫০	৬৪২	৫,৬৮,০০০
২০২১-২২	৩৬৫	৭০২	৬,০৩,৬৮১
২০২২-২৩	৩৫৭	৯৯০	৬,৭৮,০৬৪

উপরের বরাদ্দচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, সাত বছরের ব্যবধানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ বেড়েছে ১৬ শতাংশের মতো।

একই সময়ে, জাতীয় সম্মিলিত বরাদ্দের মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের হিস্যা ২০১৬-১৭ এর দশমিক শূন্য নয় শতাংশ (.০৯%) কমে সাত বছর পরে দাঁড়িয়েছে দশমিক শূন্য ছয় শতাংশে (.০৬%)। অর্থাৎ ঐ হিসাবে বরাদ্দ বাড়েনি, বরং কমেছে।

অন্যদিকে, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হিস্যা ছয় বছর আগের দশমিক ১৬ শতাংশ (.১৬%) থেকে সর্বশেষ বাজেটে দাঁড়িয়েছে দশমিক ১৪ শতাংশে। অর্থাৎ জাতীয় মোট বরাদ্দে এই মন্ত্রণালয়ের হিস্যাও কমে গেছে। যদিও এই মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দের আর্থিক অংক সাত বাজেট পেরিয়ে ৫৬০ কোটি থেকে ৯৯০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

শ্রম সংশ্লিষ্ট দুটি মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত বাজেট প্রবণতা থেকে এটা অনুমান করা যায়, জাতীয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে শ্রমখাত কম মনযোগ পাচ্ছে, কম গুরুত্ব পাচ্ছে। অর্থাৎ বরাদ্দের অগ্রাধিকার তালিকায় নেই তারা। বছরওয়ারী জাতীয় বরাদ্দের হিস্যায় শ্রমজীবীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর অংশীদারিত্ব বাড়ছে না।

যদিও অর্থের অংকে উভয় মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ পাঁচ বছরের ব্যবধানে কিছুটা বেড়েছে– বিশেষ করে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে, কিন্তু শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সর্বশেষ অর্থবছরে যৌথভাবে বরাদ্দ পেয়েছে সামগ্রিক বরাদ্দের দশমিক ১৯ শতাংশ (.১৯%)। দেখা যাচ্ছে, দেশের শ্রমজীবী ও প্রবাসী শ্রমজীবীদের জন্য যে দুই মন্ত্রণালয় কাজ করবে তারা যৌথভাবে জাতীয় বরাদ্দের এক ভাগ বরাদ্দও পাচ্ছে না। অথচ এই দুই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মানুষরা দেশে-বিদেশে অর্থনীতির মূল শক্তি ও ভরসা।

দুই

‘শ্রম-বাজেট’ কীভাবে খরচ হয়?

বাজেটে শ্রম মন্ত্রণালয় বা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় যে বরাদ্দ পায়– তাকে যদি আমরা ‘শ্রমবাজেট’ হিসেবে উল্লেখ করিও– সেটা কিন্তু পুরোটা শ্রমিকদের জন্য সরাসরি খরচ হয় না। মন্ত্রণালয়ের বাজেটের একটা অংশ থাকে পরিচালনা ব্যয় এবং কিছু থাকে উন্নয়ন ব্যয়। সব মন্ত্রণালয়ের বেলায় এটা সত্য। তবে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ব্যয়ে খোদ শ্রমিকদের জন্য কি হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারবো বাজেটের বরাদ্দ বিশ্লেষণ থেকে। এক্ষেত্রে আমরা শ্রম মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের দিকে মনযোগ দিলে নীচের চিত্র পাই:

২০২১-২২ অর্থবছরে শ্রম মন্ত্রণালয়ের জন্য পরিচলন খাতে বরাদ্দ ছিল ১৭৯ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। আর উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১৮৫ কোটি ৭৩ লাখ টাকা। দেশের কোটি কোটি শ্রমিকের উন্নয়নে প্রকৃত বরাদ্দ ঐ শেষের অংকটুকু।

এই উন্নয়ন বাজেট কীভাবে খরচ হয় এবার সেটা মনযোগ দিয়ে দেখতে পারি আমরা। এই লেখা তৈরির সময় ২০২২-২৩ অর্থ বছর শেষ হয়নি। তাই আমরা আগের বছরের বাজেটকে বিবেচনার জন্য নিতে পারি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে যে বিভাগগুলোর মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের টাকা ব্যয় হয়েছে তা হলো: শ্রম-সচিবালয়, শ্রম অধিদপ্তর এবং কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

এর মধ্যে শ্রম-সচিবালয় ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য কাজ করার কথা। যাতে ছিল ‘দেশব্যাপী তৈরি পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন’ এবং ঢাকায় ‘সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিরসন’ বিষয়ে দুইটি প্রকল্প। এর বাইরে রাজশাহীতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনেও কাজ করার কথা তাদের। এসবে বরাদ্দ ছিল ৯২ কোটি ২৩ লাখ টাকা। এর বাইরে শ্রম অধিদপ্তর দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কাজ বাড়াতে রাঙামাটির ঘাঘড়ায় ‘শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র’ নির্মাণ এবং নারায়ণগঞ্জ বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ‘মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল’ এবং ৫ শয্যা বিশিষ্ট ‘শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র’ তৈরির ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করার কথা। তার জন্য বরাদ্দ ছিল ১৬ কোটি ১৫ লাখ টাকা।

তৃতীয়ত ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে দেখানো ছিল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। যার লক্ষ্য হিসেবে রয়েছে পোষাক শিল্প ও চামড়া শিল্পে নারীর ক্ষমতায়ন, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা। এছাড়া এই সংস্থার কাজের তালিকায় ছিল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ জেলায় (চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, সিলেট ও দিনাজপুয়ে) কার্যালয় স্থাপন; নির্বাচিত তৈরি পোশাক, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপন। এসবের জন্য বরাদ্দ ৭৭ কোটি ৩৫ লাখ টাকা।

লক্ষ্য করার বিষয়, সরকারের এই প্রকল্পগুলো বেশির ভাগই ৩-৫ বছর মেয়াদি। অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পগুলো চলমান থাকে

এবং পুরোনো প্রকল্পগুলোতে নতুন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এসব কাজের কয়েকটি বাদে বেশির ভাগ শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা অধিদপ্তরের নিয়মিত কর্মসূচির মধ্যে পড়ে। আবার এসব কর্মসূচিতে অনেকখানি সম্পদ ব্যয় হয় ইট, সিমেন্ট কেন্দ্রীক উন্নয়ন যজ্ঞে।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত প্রধান এক লক্ষ্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। উপরোক্ত বছরের বাজেটে শুধু তৈরি পোশাক খাতসহ অল্পকিছু প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের শ্রমমান উন্নয়নের বিষয়ে কাজের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখন প্রায় ৮৫ ভাগ শ্রমজীবী অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের সাথে যুক্ত। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের কর্মক্ষেত্র উন্নয়ন বা নিরাপত্তা সম্পর্কে মোটাদাগে কোন উল্লেখ বা বরাদ্দ দেখা যায়নি সাম্প্রতিক বাজেটসমূহে। এছাড়া শ্রমজীবীদের স্বার্থের দিক থেকে বাজেটে তাদের জনপ্রিয় দাবিগুলোর বিষয়েও কোন সুরাহা পাওয়া যায় না। যেমন, শ্রমিকদের রেশন, চিকিৎসা ও আবাসন সংকট বিষয়ে বড় আকারে কোন কর্মসূচির উল্লেখ পাওয়া যায়নি ২০২২-২৩-এর বাজেটেও। শ্রমজীবীদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের দাবি শুধু দাবিই থেকে গেছে।

সরাসরি শ্রমিক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বাইরে বাজেটে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দেও শ্রমজীবীদের জন্য দরকারি বিষয়গুলো চাইলে আরও বেশি গুরুত্ব পেতে পারতো। যেমন, ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটে পরিসংখ্যান ব্যুরোর জন্য বরাদ্দ কয়েক গুণ বাড়ানো হয়েছিল। এই বরাদ্দের মাধ্যমে অনায়াসে শ্রমিকদের ডাটাবেস তৈরিকে গুরুত্বের সঙ্গে রাখা যেত। কিন্তু সেরকম কোন পরিকল্পনা দেখা যায়নি। অথচ করোনাকালে প্রণোদনা দেয়ার সময় এরকম একটা ডাটাবেইসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে

সরকারি-বেসরকারি সবাই।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক জোন তৈরিকে ২০২১-২২ সালের বাজেটে গুরুত্ব দেয়া হয়। অথচ পাশাপাশি বন্ধ ঘোষিত পাটকলগুলোর বেকার শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উক্ত অর্থনৈতিক জোনগুলোতে কীভাবে পুনর্বাসিত করা যায় সেরকম সহায়ক কোন কর্মসূচি পাওয়া যায়নি। বন্ধ হওয়া পাটকলগুলো ২০২৩ সালেও চালু হয়নি। সেখানকার বেকার হওয়া শ্রমিকদের বিষয়ে কি রাষ্ট্রের বা সরকারের কোন দায় নেই? এখাতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের কৃষিসমাজের গুরুত্বপূর্ণ এক পণ্যের বাজার-ভবিষ্যত।

২০২১-২২ এর বাজেটে সামাজিক সুরক্ষায় জিডিপির প্রায় তিন শতাংশ সমপরিমাণ বরাদ্দ রাখা হয়। টাকার অংকে যা প্রায় এক লাখ কোটিরও বেশি। বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ১৩ শতাংশেরও বেশি সেটা। কর্মসূচির সংখ্যাও বিপুল– প্রায় দেড় শত। কিন্তু তাতে সুনির্দিষ্টভাবে মহামারিতে কাজ হারানো অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ছিল না। অথচ তারা সক্রিয় শ্রমশক্তির ৮৫ ভাগ।

২০২২-২৩ সালের বাজেটে আমরা দেখেছি, সামাজিক নিরাপত্তা খাতে করোনা ভাইরাসের অভিঘাত প্রতিহত করতে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। কিন্তু তাতে শ্রমজীবীদের হিস্যা পৃথকভাবে উল্লেখ না করে তহবিলের পুরাটা রাখা হয় সকলের জন্য। একইভাবে বাজেটে করোনাকে মাথায় রেখে স্বাস্থ্যখাতে বিপুলভাবে বরাদ্দ বাড়লেও (প্রায় ১২ শতাংশ বৃদ্ধি) দেশব্যাপী শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গভাবে টিকার আওতায় নিয়ে আসার জন্য পৃথক কোন উদ্যোগ দেখা যায় না।

তিন

বাজেটকালে শ্রমিকরা কী চায়?

সংবিধানের ১৪ ও ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদের বাস্তবায়ন

সংবিধান যেহেতু 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি'র অংশ এবং 'প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন'– সেজন্য সংবিধানের মূলনীতির আলোকে বাজেটের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস চায় শ্রমিকরা। যেমন, বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪ ও ১৫ নং অনুচ্ছেদ বলছে:

> ১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে—এবং জনগণের অনগ্রসর অংশকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।
>
> ১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে...
>
> (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা;
>
> (খ) ...যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্ম-সংস্থানের অধিকার নিশ্চিত করা;
>
> ... ...
>
> (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার...অভাবের সময় সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা।

সংবিধানের এসব অনুচ্ছেদের বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট আইনগত ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে এখনি।

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি

বিশ্বের অন্তত ৭৫টি দেশে ইতোমধ্যে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি রয়েছে। কোথাও সেটা আছে ঘন্টার হিসাবে– কোথাও আছে দিন, সপ্তাহ বা মাসের হিসাবে। বাংলাদেশে সরকারের দারিদ্র্য নির্মূল কর্মসূচি সফল করতে হলে এবং শ্রমিকদের জীবনমান বাড়াতে হলে শ্রমের ন্যূনতম দর ঠিক করা দরকার। মজুরির জাতীয় ন্যূনতম মানদন্ড ছাড়া সরকার অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কোটি কোটি কর্মজীবী পরিবারকে দরিদ্র অবস্থা থেকে চূড়ান্তভাবে উদ্ধার করতে পারবে না। অথচ দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সরকারের প্রধান লক্ষ্য। বলা যায়, জাতীয় বাজেটের মূল লক্ষ্য ব্যাহত হচ্ছে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি আইনের অভাবে।

এছাড়া এবার বিশেষভাবে পোশাকখাতের শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে দিকনির্দেশনা দরকার। এ খাতে সর্বশেষ মজুরি বাড়ার পর ইতোমধ্যে ৫ বছর সময় হয়ে গেছে। এর মাঝে সকল ধরনের জিনিসপত্রের দাম, যাতায়ত খরচ এবং বাড়ি ভাড়া বেড়েছে বহু গুণ। ফলে অবিলম্বে পোশাক খাতে নতুন বর্ধিত মজুরি কাঠামো ঘোষণা করা দরকার। শ্রমিক সংগঠনগুলো ইতোমধ্যে এখাতে ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা করার দাবি তুলেছে। সংগঠকদের অনেকে বলছেন, পোশাক খাতের মালিকরা যখন 'ডলারে'র হিসাবে অধিক মুনাফা পাচ্ছে সেখানে শ্রমিকরা মজুরি পাচ্ছে দাম পড়ে যাওয়া 'টাকা'র হিসাবে। সেই মজুরিও আবার ৫ বছর আগে নির্ধারিত– যা চরম এক বৈষম্যের নজির।

শ্রমিকদের বসবাসের জন্য জেলায় জেলায় আবাসন বানাতে হবে

পাকিস্তান আমলে পাটসহ বিভিন্ন খাতে শ্রমিকদের জন্য বিস্তর কলোনি ছিল। অথচ স্বাধীন দেশে সবচেয়ে বড় শ্রমখাত পোশাক শিল্পে এক শতাংশ শ্রমিকও থাকার জায়গার প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা পান না। বাংলাদেশ যখন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শ্রমিক প্রেরণের বিষয়ে চুক্তি করে তখন সেখানে আবাসন সুবিধা চাওয়া হয়। ঠিক একইভাবে নিজ দেশে কর্মস্থলের আশে-পাশে মালিকদের দ্বারা শ্রমিকদের থাকা নিশ্চিত করার বিষয়ে মনযোগ দিতে হবে এখন।

শ্রমিকদের জন্য পৃথক হাসপাতাল দরকার

শ্রমিকদের সুস্থতা শিল্পের স্বার্থেই জরুরি। শ্রম-আইনে পেশাগত কারণে শ্রমিকদের ৩৩ ধরনের ব্যাধির উল্লেখ আছে। শিল্পের বিকাশ যেভাবে ঘটছে, ব্যাধি যেভাবে বাড়ছে সেভাবে নেই শ্রমিকদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল। প্রতিটি জেলার শিল্পঘন এলাকাগুলোতে শ্রমজীবীদের জন্য হাসপাতাল দরকার। বাড়ি ভাড়া ও প্রাইভেট মেডিকেলের খরচ শেষে শ্রমিকদের হাতে খাওয়া-খরচ বিশেষ কিছু থাকে না।

রেশন কার্ড চাই

খাদ্য কেবল বেঁচে থাকার জন্য নয়। শ্রম উৎপাদনশীলতার জন্যও খাবারের সংস্থান দরকার এবং সেজন্যই বর্তমান বাজারে শ্রমিকদের রেশন পাওয়া জরুরি। বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের লাগামহীন দামবৃদ্ধিতে শ্রমিকরা প্রায় কেউ এখন আর তৃপ্তি করে ভরপেট খেতে পারছে না। দেশজুড়ে রেশনের দোকান স্থাপন করতে হবে এবং এরকম যেকোন দোকান থেকে একজন শ্রমিক তার

কার্ড দেখিয়ে যাতে বরাদ্দ তুলতে পারে সেরকম ডিজিটাল ব্যবস্থা করতে হবে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ভাতা

সর্বশেষ শ্রম জরিপে বলা হয়েছে দেশে কর্মজীবী নারী আছেন আড়াই কোটি। এর বড় অংশই কাজ করেন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মজীবী নারীরা শ্রমিক হয়েও শ্রম আইনের সুবিধাবঞ্চিত। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও আর্থিক সুবিধা আছে। কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের (যেমন, গৃহশ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক ইত্যাদি) জন্য গর্ভকালে কোন সুবিধা নেই। বিশ্বের অনেক দেশে এরকম সুবিধা আছে। তার জন্য রাষ্ট্রের খরচ হয় সামান্যই। বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে বাংলাদেশেও এরকম কর্মসূচির বাস্তবায়ন হওয়া দরকার।

সকলের জন্য পেনশন দরকার

যেসব কর্মজীবী-শ্রমজীবী পেনশন পান না– তাঁরা দু'ভাবে অসমতার শিকার। তারা যে কেবল পেনশন পান না তাই নয়– অন্য স্বল্প সংখ্যক মানুষের পেনশন পাওয়ায় রাষ্ট্রীয় সম্পদের যোগান দিতে হচ্ছে তাদের। এই অন্যায্য অবস্থা বদলাতে এবং কোটি কোটি শ্রমজীবী-কর্মজীবীর বার্ধক্যকে অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তামুক্ত করতে এখনি দেশে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা কায়েম দরকার। সরকার ২০২৩-এ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা বিল-২০২৩' সংসদে পাস করিয়েছে। কিন্তু গত এক বছরে এই বিষয়ে বাস্তব কাজের আর কোন অগ্রগতি দেখা যায় না। তাছাড়া এখনও বোঝা যাচ্ছে না জনগণ চাঁদা দেয়ার পর সরকার এই

উদ্যোগে কীভাবে, কী পরিমাণ অর্থ দিবে বা অংশগ্রহণ করবে। এটা স্পষ্ট করার পাশাপাশি এই উদ্যোগকে শ্রমিক বান্ধব করা দরকার। এছাড়া এই উদ্যোগের পরিচালনা পর্ষদে অবশ্যই শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি রাখতে হবে।

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলকে শ্রমিকদের সহায়তায় আরও সক্রিয় করা

শ্রম আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে অন্তত তিন ধরনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল রয়েছে। এক ধরনের কল্যাণ তহবিল আছে কারখানা পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের নীট মুনাফার অংশ বিশেষ দিয়ে।

এ ছাড়াও আরেকটি আছে সরকারকর্তৃক গঠিত এবং সকল শ্রমিকের জন্য। এছাড়া বিশেষ খাত হিসেবে পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য আরেকটা কল্যাণ তহবিল আছে। এ তহবিলের অর্থ আসে পোশাক খাতের রফতানি-অর্ডার থেকে নির্ধারিত হারে।

শিল্প মুনাফার ৫ শতাংশের সুবিধা শ্রমআইন অনুযায়ী শ্রমিকরা পাচ্ছে কি না, সেসব জমাকৃত অর্থ আইনমতো খরচ হচ্ছে কি না বা শ্রমিক কল্যাণে ব্যয় হচ্ছে কি না তার জন্য স্থায়ী তদন্ত কাঠামো প্রয়োজন। অর্থমন্ত্রণালয় বাজেট প্রণয়নকালে শ্রমিকদের স্বার্থে এ বিষয়ে মনযোগী হবে বলে শ্রমিকদের প্রত্যাশা।

প্রবাসী শ্রমিকদের দেশে ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা

এক কোটির বেশি প্রবাসী-বাংলাদেশীর পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশের অর্থনীতির বড় ভরসা এখন। জনসংখ্যার এই বিপুল অংশ থেকে শ্রমের ফসল গ্রহণ করা হলেও দেশ কীভাবে চলবে সে বিষয়ে মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা নেই। জাতীয় ভোট প্রক্রিয়ায়

সকল দেশে থাকা বাংলাদেশী শ্রমিকদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করতে অবিলম্বে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ দরকার। নির্বাচন কমিশনকে এ বিষয়ে কাজে নামাতে এবারের জাতীয় বাজেট প্রণয়নকালেই নীতিগত ও আর্থিক দিকনির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

বেকারের সংজ্ঞা পাল্টানো দরকার

সর্বশেষ শ্রমজরিপে বলা হয়েছে, দেশে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ৩০ হাজার। এরকম তথ্যে অনেকে বিস্মিত হয়ে বলেছেন– যে সংজ্ঞার আলোকে জরিপ বিভাগ বেকারের সংখ্যা নির্ধারণ করেছে তাতে সমস্যা আছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ করলে কেউ আর বেকার নন। এরকম সংজ্ঞা দিয়ে বেকারের প্রকৃত সংখ্যা কমিয়ে দেখানো গেলেও জাতীয়ভাবে দেশের কোন লাভ না তাতে। বরং সংজ্ঞাটা আরও প্রসারিত করে বেকারদের প্রকৃত সংখ্যা জানা গেলে যথাযথ কর্মসংস্থান নীতি ও কৌশল নেয়া যায়।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের বাজেটে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তথ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য 'কর্মসংস্থান অধিদপ্তর' নামে নতুন অধিদপ্তর চালু করার কথা বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করা হলেও সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন বরাদ্দ যেমন বাজেটে ছিল না–পরবর্তীকালে এরকম দপ্তরের কোন তৎপরতাও বেকাররা দেখছে না। এবারের বাজেটে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হওয়া দরকার।

প্রচারে:

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি

৬/৫ এ, স্যার সৈয়দ রোড (২য় তলা)
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: +৮৮ ০১৯৭৪৬৬৬৮৯০
ই-মেইল : info@safetyandrights.org
ওয়েবসাইট: www.safetyandrights.org